**Pratidhwani the Echo**
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
**ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)**
**Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-III, April 2026, Page No. 184-191
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
**DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.03W.096**

# অনিল ঘড়াইয়ের ‘পাতা ওড়ার দিন’উপন্যাসের দোলা চরিত্র: এক নারীর আত্মমর্যাদা রক্ষার সংগ্রাম

**রুমকি প্রামাণিক,** *গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.04.2026; Accepted: 27.04.2026; Available online: 30.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## Abstract

One of the main female characters in this novel is named Dola. She is an ordinary housewife. Her husband's name is Jagannath. Her daughter's name is Joyee. Her husband is blind and unemployed, so she has to depend on her brother-in-law, Jaydev, to run their family. Because of this, Jaydev even raises his hand against her for minor matters. Her mother-in-law, Ashalata, also calls her a coward, swears. Jagannath, despite knowing everything, does not protest. Because if he protests, he will have to sit on the road with his wife and daughter. When Dola was raped by her brother-in-law one day, her husband remained silent. Therefore, she is proud of her husband and leaves home to maintain her self-respect. With Ratan's help, she gets a job at a nursing home. In the meantime, she becomes pregnant.When Jagannath was told everything, he refused to take responsibility for the child and slandered him. Then Dola gives birth to a child and raises that child alone. She also gets a promotion at work and her salary doubles. Besides, she also takes care of her grandparents' family.

She is an O.T sister at a nursing home. How she turned her life around from an ordinary housewife to one that endured all the humiliation and maintained her self-respect. This matter has been discussed in this paper.

**Keywords:** Anil Ghorai, Pata orar din, Success, Novel, Struggle.

আমাদের দেশে গার্হস্থ্য সহিংসতা এক গভীর ও বিস্তৃত সামাজিক সমস্যা। মূলত গৃহবধূরাই এর শিকার হন। পণের চাহিদা, কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়া, স্বামীর অন্য মহিলার প্রতি আসক্তি ইত্যাদি নানা কারণে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁদের ওপর দৈহিক, মানসিক নির্যাতন করে। অনেক সময় তাদের যৌন নির্যাতনেরও শিকার হতে হয়। এর প্রতিরোধে ২০০৭ সালে লোকসভায় ‘Protection of Women from Domestic Violence Bill 2005’ পাস করা হলেও, এই আইনের সুফল তেমনভাবে পাওয়া যায় না। যুগ যুগ ধরে নারীদের এমন অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতে হয়।

এমনই এক নারী হলেন এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান নারী চরিত্র দোলা। তার স্বামী জগন্নাথ একজন বেকার ও অন্ধ মানুষ। বিয়ের তিনবছরের মাথায় মুখে ও চোখের সীমিত অঞ্চলে জলবসন্ত হওয়ায় তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়। সে চাকরি করত স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ডে। দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলার জন্য তার চাকরিটা চলে যায়। তাদের সংসারের পুরোটাই নির্ভর করত তার একার আয়। ফলে চাকরি হারাবার পর সংসারে অভাব দেখা দেয়। স্ত্রী দোলা তাকে সাহস দিলেও তার বাবা,মা, ভাই সহজভাবে ব্যাপারটাকে মেনে নেয়নি।

স্বামীর এই অবস্থার জন্য শাশুড়ি আশালতা দোলাকে দায়ী করে। সে তাকে অপয়ার ঢেঁকি বলে। তারজন্য নাকি জগন্নাথের এই অবস্থা হয়েছে। আশালতার অপমানকর কথার তীব্র নিক্ষেপে দোলার বেঁচে থাকা অসহ্যকর

হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে সে চুপ করে থাকে। প্রথমদিকে অশান্তি চরমে উঠলে তার স্বামী প্রতিবাদ করলেও, ইদানিং সে চুপ করে থাকে। কারণ ভাই জয়দেবের দয়াতে তার সংসার চলে।

দোলার মেয়ে জয়ী যখন জন্মায়, তখন আশালতা মেয়ে হয়েছে বলে হাসপাতালে দেখতে পর্যন্ত আসেনি। এমনকি জগন্নাথকেও আসতে দেয়নি। দোলা সেকথা জানতে পেরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলে হাসপাতালের বৃদ্ধা নার্স তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, তার সেবা করেছিলেন।

দোলার দেওর জয়দেব সংসারে টাকা দেয় বলে সামান্য কথাতেই তার গায়ে হাত তোলে। সংসারে কেউ কোনো প্রতিবাদ করে না। সবাই তাকে সমীহ করে চলে। দোলা ভেবেছিল অন্তত তার স্বামী এর প্রতিবাদ করবে, রাগে ফুঁসে উঠবে তার পক্ষ নিয়ে, অথচ কোনোরকম উত্তেজনা প্রত্যক্ষ করেনি দোলা জগন্নাথের মধ্যে। যার হাত ধরে সে এই বাড়ির বউ হয়ে এসেছে অন্তত তার সমর্থন আশা করেছিল সে সেদিন।

একদিন জয়ীর দুধ, সাবু ঘরে কিছু না থাকায় দোলা জয়দেবের কাছে একটা দুধের কৌটো কেনার জন্য কিছু টাকা চাইতে গেলে সে তাকে খারাপ প্রস্তাব দেয়-

> "জয়দেবের চোখ দুটো ধকধকিয়ে উঠল কামনার আগুনে, খাবে আমার আর শোবে দাদার কাছে তা তো হয় না। এঘরে থাকতে হলে আমার কথা তোমাকে এখন থেকে শুনতে হবে। আমি যা চাইব-তোমাকে তা দিতে হবে। আপত্তি করলে চুলের মুঠি ধরে অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দেব। সভার মাঝে কাঁদলেও কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করবে না।"[১]

এই কথা শুনে দোলার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে, অপমানে লাল হয়ে যায় কান। সে একটা পেয়ারা ডাল তুলে তাকে আঘাত করে। সে চিৎকার করে উঠোনে লুটিয়ে পড়ে। আশালতা পেয়ারা ডালটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তাকে গালি দেয়। স্বামী জগন্নাথ তার একাজ করা অন্যায় বলে তাকে শাসন করতে গেলে সে বলে-

> "এতদিন অনেক সয়েছি, আর পড়ে পড়ে মার খাব না। এবার আমার গায়ে হাত তুললে আমি তার হাত ভেঙে দেব।"[২]

এই ঘটনার পর কিছুদিন জয়দেব তার সাথে কথা বলা বন্ধ রাখে। আশালতা চেয়েছিল এই সুযোগে তাকে সংসার থেকে উৎখাত করতে। সে মাটি কামড়ে থাকে এখানেই, কিছুতেই হার মানে না।

জগন্নাথ আগে এরকম ছিল না, সে ছিল প্রাণশক্তিতে ভরপুর। সে দোলাদের গ্রামে তার বড়দার সাথে যাত্রা দেখতে গিয়েছিল। সেখানে সে একদিন তার সাথে পানবরজ দেখতে যায়। সেই পানবরজেও সে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। দোলা শত চেষ্টা করেও তার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে ব্যর্থ হয়। গ্রামে সুন্দরী হিসেবে সে পরিচিত ছিল। স্কুল থেকে ফেরার পথে অনেক ছেলে তার পেছন ছাড়ত না। তাদের মধ্যে থেকে সে কাউকে জীবনসঙ্গী করতে পারত, যদি না সে জগন্নাথকে কথা দিত। শেষপর্যন্ত সে তাকেই সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছিল, কথার খেলাপ সে করেনি।

একদিন ঝড়ে দোলার ঘরের হ্যারিকেনের কাঁচ ভেঙে গেলে যখন সে ভাঙা কাঁচগুলো পেছনের বাগানে ফেলতে যাচ্ছিল, তখন আশালতা দেখতে পেয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে। কাঁচ ভেঙে ফেলার জন্য তাকে চরম অপমান করে।

জয়দেবের পাটের ব্যবসা ভালোই চলছিল। ফলে সে অনেক টাকার মুখ দেখছিল। সে বন্ধুদের নিয়ে মদ খায়, অধিক রাতে বাড়ি ফেরে। টালমাটাল পায়ে তাকে বাড়ি আসতে দেখে দোলার প্রাণ শুকিয়ে যায়। রাতে

জয়দেবকে খেতে দেওয়ার দায়িত্ব দোলার। সে যতক্ষণ খায়, ততক্ষণ তাকে বসে থাকতে হয়, তার কথা শুনতে হয়।

একদিন রাতে জয়দেব মদ খেয়ে দেরি করে বাড়ি ফিরেই চটি ছুঁড়ে দেয় ঘরের মাঝখানে। কাঠের চেয়ারে বসে দোলাকে দেখতে থাকে। পাশের ঘরে আশালতা, বনমালী তখন ঘুমে মগ্ন। জগন্নাথ তার ঘরে জেগে আছে, দোলা ঘরে না আসা পর্যন্ত সে জেগেই থাকে। খেতে বসে জয়দেব তরকারির বাটি ছুঁড়ে মারে, দোলার নিজেকে জঞ্জালের মতো মনে হয়। খাওয়া–দাওয়া শেষ হলে জয়দেব হাত ধুতে গিয়ে পড়ে যায়। দোলা ছুটে গিয়ে কোনোমতে তাকে দাঁড় করায়। সে দেখতে পায় তার চোখে বুনো উন্মাদনার সুর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে সে তার দিকে চেয়ে আছে। দোলা তাকে ধরে এনে বিছানায় শুইয়ে দেই। সে তার হাত চেপে ধরে বলে-

> "বৌদি, তুমি চলে যেও না। অন্তত আজকের রাতটা আমার এখানে থাকো, আমার মনের অবস্থা ভালো নেই, তুমি থাকলে আমি শান্তি পায়।"[৩]

সে যেতে চাইলে দুই হাতে ভর দিয়ে জয়দেব ছিটকানিটা আটকে দিতে চাইলে সে আর্তনাদ করে ওঠে। জয়দেব বলে যে চিৎকার করে কোনো লাভ নেই। বাঁচার জন্য দোলা কেরোসিন ল্যাম্পটা সজোরে ছুঁড়ে মারে তার দিকে। সেটি তার মুখের ওপর পড়ে মুখ পুড়ে যায়। পোড়া মুখ নিয়ে সে অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। দোলা সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করে প্রতিহত করার। পুরুষ হিংস্রতার কাছে সে শেষপর্যন্ত হার মেনে যায়।

চোখের জল নিয়ে সে ঘরে ফিরে এসে স্বামীকে বসে থাকতে দেখে। কান্নায় ভেঙে পড়ে সে তাকে সব বলে। সবকিছু শুনে জগন্নাথ বলে যে সে অন্যের দয়া নিয়ে বেঁচে আছে, তার প্রতিবাদ করা সাজে না-

> "আমার বুকের ভেতরে বাজ পড়েছে। শুধু জয়ীর মুখ চেয়ে আমি আমার এই জীবনটাকে এখন বাঁচিয়ে রেখেছি। আমি ওর বাবা, ওর ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে পারি না। জয়দেবকে কিছু বললে – সে আমাদের হাত ধরে বাজারের মোড়ে বসিয়ে দেবে।"[৪]

একথা শোনার পর দোলা তাকে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করে। সে বলে যে, সে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। মেয়ের দায়িত্ব জগন্নাথকেই নিতে হবে। সে আরও জানায় যে, সে বাপের বাড়ি গিয়ে দাদাদের গলগ্রহ হবে না।

দোলাদের গ্রামে সেই ছিল একমাত্র পি.ইউ. পাস করা মেয়ে। তার বাবার ইচ্ছা ছিল সে যাতে বি.এ. পাস করে। জগন্নাথকে বিয়ে করার দরুন তার আর পড়াশোনা করা হয়নি। সে যদি পড়াশোনা করত তাহলে আজ তার এই সর্বনাশ হত না। নারীর আদর্শ হল তার চরিত্র ও সতীত্বকে রক্ষা করা। সে বলে যে, সে মূর্খ নয় কোথাও না কোথাও কাজের ব্যবস্থা ঠিক তার হয়ে যাবে। এই অপমানের ভাত গলা দিয়ে তার আর নামবে না।

সে সেই রাতেই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে গেলে জয়ী দুধের জন্য ক্ষিদেয় কেঁদে উঠলে তাকে দুধ খাওয়াতে গিয়ে তার আর যাওয়া হয় না। পরদিন ভোরবেলায় সে বেরিয়ে যায়-

> "খাট থেকে খুব সন্তর্পনে নেমে এলো দোলা। জগন্নাথের পা দুটি মশারীর কাছে এসে বাধা প্রাপ্ত ঢেউর মত কুঁকড়ে আছ। ঐ পা দুটির দিকে নির্নিমেষ চেয়ে থাকল দোলা। নীরব অশ্রুপাতে হৃদয়ে প্রকটিত হচ্ছে অস্থিরতা। মশারীটা তুলে বিনম্র চিত্তে ঐ পা দুটো হাত দিয়ে স্পর্শ করল দোলা, সম্ভবত এটাই তার স্বামীর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা।"[৫]

মশারীটা গুঁজে দরজার কাছে এসে সে দাঁড়িয়ে খিলকাঠ এবং ছিটকানি খোলে। তার খুব কষ্ট হয়। কষ্ট হলেও তাকে যে যেতেই হবে। চরম অপমানিত হওয়ার ফলে তার মন ভেঙে গিয়েছে। সে অনেক আগেই জগন্নাথকে সঙ্গে নিয়ে অন্যত্র চলে যেতে চেয়েছিল। সে শিক্ষিতা, যেকোনো একটা কাজ সে অনায়াসে জোগাড় করে ফেলতে পারত। কিন্তু তার স্বামী পরিবার ছেড়ে তার সঙ্গে অন্য জায়গায় যেতে চায়নি। সে তার ওপর

সম্পূর্ণ ভরসা করতে পারেনি। দোলা সত্ব চেষ্টা করেও জয়দেবের কাছে হেরে যায়। তার জন্যই তাকে স্বামী, সন্তান ছেড়ে গৃহত্যাগ করতে হল।

শ্বশুরবাড়িতে থাকতে তাকে একবার জয়দেব পাগল সাজিয়ে দিনের পর দিন বাথরুমে আটকে রেখেছিল। কেউ কোনো প্রতিবাদ করেনি, এমনকি জগন্নাথও নীরব ছিল। শ্বশুর বনমালী বাথরুমের দরজা খুলে তাকে মুক্ত করেছিল। শাশুড়ি আশালতা তো রটিয়ে দিয়েছিল যে তাকে ভুতে ধরেছে এবং সেজন্য তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। জয়দেবের নির্দেশে গুণিন এসেছিল, তাকে নগ্ন করে সুযোগ নিতে চেয়েছিল। নিজের বুদ্ধির জোরে সে সেদিন বেঁচেছিল। তার স্বামী সেদিনও কোনো প্রতিবাদ করেনি।

অপমান নিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সে দত্তদের আমবাগানে পৌঁছায়। নিজেকে তার তখন একজন হেরে যাওয়া মানুষ বলে মনে হয়। সে একটা আমগাছের ডালে তার পরনের শাড়িটা জড়িয়ে নেয়, শাড়ির অন্যপ্রান্ত বাঁধে নিজের গলায়। ঝুলে পড়ার মুহূর্তে রতন এসে তাকে বাঁচায়। সে কলকাতায় থাকে চাকরিসূত্রে। প্রতি সপ্তাহে সে গ্রামের বাড়িতে আসে, তার স্ত্রী গ্রামের বাড়িতে থাকে। তার পরনে ধুতি, খালি গা। সে সাদাসিধে ভাবেই নিজের জীবন কাটাতে চায়। সে দোলাকে ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে-

> "দোলা কিছুতেই ঘরের দিকে যাবে না। সে হাতজোড় করে বলে, আমাকে ছেড়ে দাও রতন্দা, আমি তো মরার জন্যই প্রস্তুত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছি – আমাকে আটকে রাখলেও আমার মন মানবে না। আত্মহত্যা করাটাও মনে হয় মানুষের একধরনের নেশা। আমি এখন সেই নেশার জ্বালায় ছটফট করে মরছি। দোহাই তোমাকে – আমাকে আর বাধা দিও না।"[৬]

সে তার আত্মহত্যা করার কারণ জানতে চাই। সে তাকে সব খুলে বলে। এরপর সে তাকে জানায় যে, সে তার বাবার কাছে যাবে এবং একটা চাকরির চেষ্টা করবে। সে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। রতন তার কথার সমর্থন করে বলে সে তার চাকরির ব্যাপারে সাহায্য করবে। তার ডাক্তার বন্ধুর নার্সিংহোমে বলে কয়ে ঢুকিয়ে দেবে। এই আশ্বাস পেয়ে দোলা তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাপেরবাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

বাপেরবাড়ি যাওয়ার জন্য সে বাস ধরে। বাসের কন্ডাক্টর মোহন তার চেনা। সে তার সাথে একই ক্লাসে পড়ত। পড়াশোনায় সে ভালো ছিল না। পড়াশোনায় ভালো না হলেও তার মনটা ভালো ছিল। দোলাদের বাড়িতেও তার যাতায়াত ছিল।

মোহন টিকিট চাইতেই তার কাছে টাকা না থাকায় সে তার দিকে বিব্রত চোখে তাকায়। সে তখন ভাবে মাত্র দুটো স্টপেজ হেঁটে গেলেই সে পারত, ঝোঁকের মাথায় সে বাসে চেপে বসেছে। টিকিট না পেয়ে মোহন চলে যায় পাশের সীটে। বাস থামতেই সে দোলার কাছে আবার আসে। তাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু দোলা তার কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয় না। তাকে সন্ধ্যেবেলায় তাদের বাড়ি যেতে বলে সেখান থেকে চলে যায়।

সকালের আলো সবে ছড়িয়ে পড়েছে চারধারে। দোলা তার বাপেরবাড়িতে প্রবেশ করে। পিতা দীনবন্ধু তাকে জামাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলে সে কেঁদে ফেলে। কান্নার শব্দ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে তার মা আরতি। তার একা আসাকে মা ভালো চোখে নেয় না। তার মাথায় চিন্তার পাহাড় চেপে বসে। দোলাও কোনো কথা না বলে চুপ করে থাকে-

> "চায়ের কাপটা দোলার দিকে অবজ্ঞা ভরে এগিয়ে দিয়ে আরতি বলল, তুই একা এলি, জয়ী কোথায়?
>
> তাকে আমি রেখে এসেছি।
>
> কেন ? দু'চোখে আগুন নয়, সহানুভুতি নয় আরতি খুবই নির্দয়ভাবে শুধোল দোলাকে।"[৭]

এই প্রশ্নের উত্তরে দোলা জানায় যে, সে নিজের ভাগ্য নিয়ে সেখান থেকে চলে এসেছে। সে তার জীবনের সাথে আর কাউকে জড়াতে চায় না। তার শ্বশুরবাড়ির লোক তাকে অপয়া বলে। সবকিছুর জন্য তাকে দায়ী করে।

দোলা ভাবে যে, জয়দেবের নির্যাতনের চিহ্ন এখনও তার শরীর থেকে মুছে যায়নি। যে করেই হোক এই অপমানের বদলা সে নেবেই। তারজন্য যা করতে হয় সে করবে। সে এখন শুধু চায় তার মায়ের সহানুভূতি। সে সবকিছু তার মাকে জানায়। সব শুনে তার মা বলে যে, তারা তাকে ফিরিয়ে দেবে না। তাদের যদি দুটো ডাল-ভাত জোটে তবে তারও জুটবে। মায়ের মুখে এই কথা শুনে সে চোখের জল আটকাতে পারে না।

সাতদিন পেরিয়ে গেলেও দোলার জয়ীর জন্য খুব কষ্ট হয়। মনটা গুমরে ওঠে। তার শশুর একদিন আসে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু দোলা তার সাথে ফিরে যায় না। সে বলে-

> "দোলা আরও বলল, কী করতে যাব? ওখানে কে আছে আমার ? যারা ছিল তাদের সবার কথা আমি ভুলে গিয়েছি, তুমি চলে যাও, বাবা। আমি তোমার অনুরোধ রাখতে পারব না।"[৮]

দোলার এই সিদ্ধান্তে তার দাদা মাথুর ও বৌদি তরুলতা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। দোলা আর চিন্তা করতে পারে না। সে হাঁপিয়ে ওঠে। সে মরতেই তো চেয়েছিল, একমাত্র রতনের জন্য বেঁচে গেল।

এই সবের মাঝে সে রতনের কথা ভুলেই যায়। তার কথা একদিন রাতে দোলার মনে পড়ে। সে সারারাত না ঘুমিয়ে সকাল সকাল উঠে পড়ে তার কাছে যাওয়ার জন্য। স্নান সেরে তৈরি হয়ে নেয়। তরুলতা এই ব্যাপারে প্রশ্ন করলে সে বলে যে, সে শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাচ্ছে না, চাকরির জন্য একজনের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে।

রতনের গ্রামের বাড়িতে দেখা করা ঠিক হবে না ভেবে সে তার শহরের বাড়িতে বাসে করে পৌঁছায়। এত সকালে তাকে দেখে রতন অবাক হয়। সে তাকে চা করে খাওয়ায়। তারপর সে তাকে মহাপাত্র নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার মহাপাত্রের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেয়। সবকিছু শুনে ডাক্তারবাবু রাজী হয়ে যান। আগামীকাল থেকে তাকে কাজে আসতে বলেন। তারপর তারা সেখান থেকে চলে আসে।

একটা রাস্তার ধারের হোটেলে তারা ভাত খাওয়ার জন্য পৌঁছায়। সেখানে খেতে বসে দোলার তার স্বামীর সঙ্গে হোটেলে খাওয়ার কথা মনে পড়ে-

> "বেশী দিনের কথা নয় – বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জন দেখতে এসে শহরের হোটেলে ভাত খেয়েছিল সে আর জগন্নাথ। সর্ষে দিয়ে ইলিশমাছের তরকারী আর সুস্বাদু মুড়িঘন্ট। খুব ধীরে ধীরে খাচ্ছিল দোলা, অথচ বাস ধরার তাড়া ছিল জগন্নাথের। পাশে বসে নিবিষ্ট মনে খাওয়া দেখছিল সে অথচ একবারের জন্য তার চোখে-মুখে কোনো বিরক্তি প্রকাশ পায়নি।"[৯]

খেতে বসে দোলার বমি পায়। সে কোনোমতে ছুটে গিয়ে একটা স্যাঁতসেঁতে জায়গায় বমি করে। রতনও ছুটে যায় সেখানে। পাশ দিয়ে তাদের বাড়ি ফেরার বাসটা বেরিয়ে যায়। সেখান থেকে রতন তাকে রিকশায় বসিয়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তার দেখে জানান যে, সে মা হতে চলেছে। একথা শুনে দোলার মুখ অন্ধকারে ভরে যায়। সেখান থেকে বেরিয়ে সে সেই রাতে রতনের বাড়িতে আশ্রয় নেয়।

রতনের বাড়িতে বারো বাই দশ মাপের একটা ঘর। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে রতন রান্নাঘরে শুতে চাইলে দোলার কথামতো তারা একই ঘরে শোয়। রতন শোয় মেঝেতে, দোলা খাটে।

ভোরবেলায় জয়দেবকে সাপে কামড়ানোর খবর নিয়ে গ্রাম থেকে দশ-বারোজন ছেলে রতনের বাড়িতে এসে হাজির হয়। তারা ঘরে ঢুকে দোলাকে দেখে। তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। তারা তাদের দুজনকে ভুল বোঝে-

> "পিস্তলের গুলির চেয়েও দ্রুত গতিতে ঘরের বাইরে ছিটকে গেল বাবলু তার দেখাদেখি আর সবাই। ভাষাহীন, বোবাযন্ত্রনা ভরা চোখে নির্নিমেষ দোলা চেয়ে থাকল রতনের দিকে। এত ভোরে রতনের সর্বাঙ্গে ঘাম ফুটে উঠেছে অস্বস্তির।"[১০]

ডাক্তার সবরকম চেষ্টা করেও জয়দেবকে বাঁচাতে পারেনি। জগন্নাথ ও জয়ী ছাড়া সকলে হাসপাতালে ছুটে যায়। দোলা ও রতনও সেখানে যায়। জয়দেবের মৃতদেহ হাসপাতালের মাঠে শোয়ানো ছিল। পুত্রশোকে আশালতা কাঁদতে থাকে এবং বনমালী মূর্ছা যায়। রতন মানসিক জড়তা কাটিয়ে আত্মবিশ্বাস নিয়ে সকলের ভুল ধারণা ভাঙানোর চেষ্টা করলে কেউ তার কথা বিশ্বাস করে না। দোলা আশালতার কাছে গেলে সে তাকে চরম অপমান করে এবং সবকিছুর জন্য তাকেই দায়ী করে। তার নিজেকে অপরাধীর মতো মনে হয়। সে রতনকে বলে যে, তার জন্যই রতন আজ সবার এমনকি নিজের স্ত্রীর চোখেও খারাপ হয়ে গেল। এর উত্তরে রতন বলে যে, তার স্ত্রী পরের কথা কানে তুলবে না। এই কথা শোনার পর দোলা কিছুটা মনের জোর ফিরে পায়।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান মিটে যাওয়ার পর দোলা জগন্নাথের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন অনুভব করে। এক বৃষ্টির রাতে চার মাইল পথ হেঁটে পৌঁছায় তার স্বামীর কাছে। সে তাকে তার আগত সন্তানের কথা জানালে তার স্বামী সন্তানের দায় নিতে অস্বীকার করে এবং বলে-

> "রতনের খুড়তুতো ভাই বাবলু সে তোমাকে ভোর রাতে রতনের বাসায় দেখেছে। তোমরা এক বিছানায় শুয়েছিলে – এটা তো শুধু বাবলু একা দেখেনি, ওর সঙ্গে আর যারা ছিল তারাও দেখেছে। এর পরে তুমি কোন মুখে আমার কাছে আসো, তোমার কি একটুও লজ্জা নেই? নাকি ভেবেছ – আমি অন্ধ বলে তুমি যা বলবে আমি তাই মেনে নেব?[১১]

একথা বলে সে তাকে ফিরিয়ে দেয়। অপমানিত দোলার চোখ থেকে জল পড়তে থাকে। সে জগন্নাথের দিকে তাকায়, তার চোখ দুটো ফুলে ওঠে অভিমানে। সে তাকে বলে যে, সে তারই শাঁখা সিঁদুর বয়ে বেড়াচ্ছে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সে এগুলোর মর্যাদা রাখবে। একথা শোনার পর জগন্নাথ ক্রোধে তার শাঁখা ভেঙে দেয়। দংশনের চিহ্ন ফুটে ওঠে দোলার দুই হাতে। যাওয়ার আগে সে জয়ীর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাইলে তার স্বামী দেখা করতে দেয়না।

সেই রাতে দোলা বৃষ্টির মধ্যে বাড়ি ফিরে আসে। তার দাদা মাথুর কোথায় গিয়েছিল জানতে চাইলে সে চুপ করে থাকে। তার চোখে মুখে পরাজয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে।

এরপর সে মহাপাত্র নার্সিংহোমে কাজে যোগদান করে। ডাক্তার মহাপাত্র তার কাজে খুবই সন্তুষ্ট হন। শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকায় সে খুব সহজেই সিনিয়র নার্সদের থেকে ও. টি. র কাজ শিখে নেয়। দশবছরের মধ্যে সে নার্সিংহোমের ও.টি. সিস্টার হয়ে যায়। তার বেতনও বেড়ে দ্বিগুণ হয়। সে দাদার সংসারেও টাকা দিয়ে সাহায্য করে।

তার সর্বক্ষণের সঙ্গী ছোটমেয়ে তুয়া। সে ক্লাস ফোরে পড়ে। দোলা কাজে বেরিয়ে গেলে তার দাদা-বৌদিই তুয়ার দেখাশোনা করে। অন্যদিকে, জয়ী ক্লাস সেভেনের ফার্স্ট গার্ল। মাথুর অনেকবার তাকে আনতে গেলেও তার বাবা আসতে দেয় না এবং সেও আসতে চায় না।

দোলা হাই প্রেসারের রোগী। একদিন বাসের মধ্যে সে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। নার্সিংহোম থেকে সাতদিনের ছুটিও নেয়, কিন্তু তিনদিনেই সে হাঁপিয়ে ওঠে। সে কাজের মানুষ, ঘরে বসে থাকতে মন চায় না। বরং কাজে না গেলেই তার অস্বস্তি বাড়ে। শুধুমাত্র জয়ীর জন্য তার মনে খুব কষ্ট হয়।

দোলা কাজে বের হওয়ার সময় বাড়ি থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত তুয়া তার সঙ্গে আসে। এইটুকু পথ আসতে আসতে বাবার কথা, দিদির কথা তাকে জিজ্ঞাসা করে। তার প্রশ্নের উত্তরে সে চুপ করে থাকে। তুয়া ফিরে যাওয়ার পর সে যেন মুক্তি পায়। জগন্নাথের কাছ থেকে ফিরে এসে দোলা ভেবেছিল সে তুয়াকে পৃথিবীর আলো দেখাবে না, কিন্তু ডাক্তার মহাপাত্রের কথায় সে তার সিদ্ধান্ত বদল করে-

> "ডাক্তার মহাপাত্র সব শুনে তিরস্কার করেছেন তাকে, মা হয়ে সন্তানের জীবন এভাবে নষ্ট করা ঠিক নয়, দোলা। মায়েদের সহনশীল হতে হয়। প্রতিটা মা-ই তো ধরিত্রীর সমান। তুমি তোমার অশুভ সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করো। যে আসছে সাদরে তাকে গ্রহণ করো, তাকে মানুষ করে তোলাই হবে তোমার আগামী দিনের কাজ।"[১২]

একদিন দোলা নার্সিংহোমে যাওয়ার জন্য বাসে ওঠে। বাস থেকে নেমে রিকশায় উঠতে যাবে তখন রতনের সাথে তার দেখা হয়। নানা কথার মাঝে সে তাকে জানায় যে, বছরখানেক ধরে তার বুকে ব্যথা হয়। রতন তাকে ডাক্তার দেখানোর পরামর্শ দেয়। সে বলে যে, তার বুকের ভেতরটায় অজস্র চিন্তায় তোলপাড় হয়। চিন্তাগুলো তাকে ছেঁকে ধরে। সে রতনকে বলে যে, তার জন্যই আজ রতনের এই বিষাদগ্রস্ত অবস্থা, তার স্ত্রী মাধুরী পাগলা গারদে দিন কাটাচ্ছে। রতন তাকে চিন্তা করতে বারণ করে। সে বলে জয়ী আর তুয়ার জন্য তাকে অনেকদিন বেঁচে থাকতে হবে। এরপর দোলা সেখান থেকে রিকশা করে নার্সিংহোমে চলে যায়।

নার্সিংহোমে যাওয়ার পর দু'দিন দোলার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। ব্যবসার কাজে মাথুর বাইরে গিয়েছিল। ফিরে এসে তরুলতার কাছে একথা শুনে সে জগন্নাথের কাছে যায়। সেখানে গিয়ে দোলা-রতনের ব্যাপারে সে সব কথা তাকে বুঝিয়ে বললে তার ভুল ভাঙে। সেখান থেকে মাথুর জগন্নাথ ও জয়ী দোলার খোঁজে বাসে করে শহরে পৌঁছায়। মাথুর যায় নার্সিংহোমে এবং জগন্নাথ ও জয়ী রতনের অফিসে। মাথুর সেখানে গিয়ে জানতে পারে দোলা সেদিনই শরীর ভালো নেই বলে সেখান থেকে চলে আসে। একথা শুনে সে রতনের অফিসে যায়। সেখান থেকে সে, জগন্নাথ, জয়ী ও রতন একসঙ্গে ট্যাক্সি করে স্টেশনে পৌঁছায়। স্টেশন মাস্টারের কাছে, জি.আর.পি অফিসে তারা খোঁজ নেয়। সেখান থেকে তারা সদর হাসপাতালে যায়। ওয়ার্ড মাস্টার নিখিলবাবু রেজিস্ট্রার খাতা দেখে জানান যে, একটা বেওয়ারিশ লাশ মর্গে পড়ে আছে। একথা শুনে মর্গের মধ্যে তারা প্রবেশ করে এবং সর্বপ্রথমে মাথুর চিনতে পারে দোলাকে। অন ডিউটি জমাদারকে দশ টাকা দিয়ে তারা তার মুখ থেকে দোলার মৃত্যুরহস্য জানতে পারে। জানা যায়, নার্সিংহোম থেকে ফেরার পথে জ্ঞান হারিয়ে সে মাটিতে পড়ে যায় এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। তার ব্যাগে কোনো পরিচয়পত্র না থাকায় এই হাসপাতালের মর্গে বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে তার স্থান হয়।

দোলার পচা লাশের ওপর জয়ী কান্নায় লুটিয়ে পড়ে। জগন্নাথ তার মৃত্যুর জন্য নিজেকেই দায়ী করে। সে বলে যে, তার শরীর, মন সবকিছুই সে বিষিয়ে দিয়েছে-

> "গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন কোন মানুষের মত চিরনিদ্রায় শায়িত ছিল দোলা। তার অস্বাভাবিক মৃত্যু মুখের হাসিটুকুও মুছে দিতে পারেনি। বরং নক্ষত্র-খচিত আকাশের মত সে যেন প্রশান্ত ছায়া বিছিয়ে শুয়ে আছে ধরিত্রী মায়ের কোলে। যে মায়ের মুখ ফোটে না শত অত্যাচারে – দোলা যেন সেই ধরিত্রী মাতার আত্মপ্রত্যয়ী আত্মজা।"[১৩]

**তথ্যসূত্র:**

১. ঘড়াই, অনিল। পাতা ওড়ার দিন। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩, পৃ. ৬৫।
২. তদেব, পৃ. ৬৬।
৩. তদেব, পৃ. ৭১।
৪. তদেব, পৃ. ৭৪।
৫. তদেব, পৃ. ৭৮।
৬. তদেব, পৃ. ৮২।
৭. তদেব, পৃ. ৮৭।
৮. তদেব, পৃ. ৮৯-৯০।
৯. তদেব, পৃ. ৯২।
১০. তদেব, পৃ. ৯৬।
১১. তদেব, পৃ. ১০০।
১২. তদেব, পৃ. ১০৫-০৬।
১৩. তদেব, পৃ. ১১৪।

**গ্রন্থপঞ্জি:**

**সহায়ক গ্রন্থ:**

১. ঘড়াই, অনিল। পাতা ওড়ার দিন। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩।